বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন কেন জরুরি

শেখ নাহিদ নিয়াজী

শেখ নাহিদ নিয়াজী

প্রকাশ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ | ০০:১৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ ‘যুগোপযোগী’ করার কথা বলে ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পুনঃপ্রণীত আইনের ৫৩টি ধারার একটিতেও একাডেমিক ও চিন্তার স্বাধীনতা বা উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কোনো শব্দ নেই। বরং বিভিন্ন ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমলাতান্ত্রিক আইনি মারপ্যাঁচের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কড়া নজরদারিতে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

একটি ধারায় রয়েছে, ‘প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত হইতে হইবে।’ অনুরূপভাবে ‘পাঠক্রম কমিটি’ সংক্রান্ত আইনের ২৪ ধারাও (যেটির কয়েকটি উপধারা বেশ অস্পষ্ট) ইউজিসির আওতাধীন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কোনো কিছুই স্ব-উদ্যোগে বা স্বাধীনভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে না। তার মানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরাম যেমন একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়া নিতে পারে না।

আইনের সিন্ডিকেট-সংক্রান্ত ১৭ ধারার কয়েকটি উপধারা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং একপেশে। সিন্ডিকেটে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদমর্যাদার কাউকেই প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, শুধু ইউজিসি মনোনীত একজন অধ্যাপক প্রতিনিধি এবং সরকার মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ ছাড়া।

ধারা ২৫ অনুযায়ী অর্থ কমিটির সদস্য হবেন ৯ জন, যেখানে ট্রাস্টি থাকবেন তিনজন, বাকি সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার সদস্য। এখানে কোনো অ্যালামনাই বা শিক্ষার্থী প্রতিনিধি রাখা হয়নি। বরং ট্রাস্টিদের মধ্য থেকে একজনকে কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এখানে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো রক্ষাকবচ বা জুতসই ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ- এগুলো মুনাফাকেন্দ্রিক। অথচ এ দেশে শিক্ষার ব্যবসায়িক ও মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেককে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা তথা সনদ প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, যেখানে পরিচালনা পর্ষদের (বিওটি) সব সদস্য একই পরিবার থেকে এসেছেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি নিশ্চিত করা অসম্ভব।

উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ রক্ষণশীল ও কর্তৃত্ববাদী হলেও সরকার সেটিকেও এড়িয়ে গিয়ে যেনতেনভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসা করার অনুমোদন দিয়েছে। যদিও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। এর মাধ্যমে একদিকে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বা সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে অপরিকল্পিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট তৈরির মাধ্যমে বেকারত্বের ঝুঁকিতে ফেলা হয়েছে লাখ লাখ সম্ভাবনাময় তরুণকে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর ৪২ ধারায় ‘দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি’ এবং ৪৩ ধারায় ‘শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকুরি প্রবিধানমালা’ নির্ধারণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফি ও অনুপযুক্ত বেতন কাঠামো বিদ্যমান। এটি অবধারিতভাবে একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। আইনের ৪ ধারায় উল্লিখিত ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয়, তন্মধ্যে শতকরা তিন ভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণ’ করার বিধান অনেকেই মানছে না। এসব শিক্ষার্থীকে সব ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত এরূপ শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দাখিলের নির্দেশনাও উপেক্ষিত। এ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নানা রকম অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর সংশোধনী এখন সময়ের দাবি। কাঙ্ক্ষিত সংশোধনে কয়েকটি সুপারিশ হতে পারে এমন: ১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে মুক্তচিন্তা, বাক স্বাধীনতা ও একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। ২) আইনগতভাবে শিক্ষকদের ইউনিয়ন (ফ্যাকাল্টি ইউনিয়ন) থাকতে হবে। তবে এটি কোনোভাবেই দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় ধারণ করতে পারবে না। ৩) শিক্ষার্থীদের ইউনিয়ন থাকতে হবে, যেটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করবে। তবে এটি কোনোভাবেই দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় ধারণ করতে পারবে না। ৪) শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৫) চাকরি নিরাপত্তা ও সার্ভিস বেনিফিট (গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন স্কিম, অর্জিত ছুটির বিপরীতে আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি), স্যাবাটিক্যাল ছুটি, মেটারনিটি ছুটি, শিক্ষা ছুটি ও গবেষণা ছুটি নিশ্চিত করতে হবে। ৬) শিক্ষার্থীর টিউশন ফি দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। ৭) অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। ৮) সুযোগ্য অধ্যাপককে (সত্যিকারের একাডেমিক ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ) ভিসি এবং প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। ৯) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে (বিওটি) একই পরিবার থেকে দু'জনের বেশি সদস্য বা ট্রাস্টি থাকতে পারবেন না। ১০) ট্রাস্টি কোনো লাভজনক পদে থাকতে পারবেন না। এমনকি বেতনভুক্ত কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন না। ১১) প্রতিবছর অথবা দুই বছর পরপর সমাবর্তন হতে হবে। ১২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল পরিচালিত হবে অবশ্যই ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে। ১৩) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে অবশ্যই তিন ভাগের এক ভাগ (৩৩ শতাংশ) সদস্য থাকবেন শিক্ষাবিদ বা শিক্ষক। ১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট অধিবেশনে শিক্ষক (প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক), শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাই প্রতিনিধি রাখতে হবে। প্রতিবছর বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ থাকতে হবে। ১৫) অর্থ কমিটিতে শিক্ষক (কমপক্ষে তিনজন) প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাই প্রতিনিধি রাখতে হবে।

শেখ নাহিদ নিয়াজী: সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

nahidneazy@yahoo.com